বিপ্রতীপ ভালোবাসা

মুর্শেদুল কবীর

জুলিয়া-উপাখ্যান

জুলিয়া নিজের ঘরে জানালার শিক ধরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। এই মূর্হুতে ওর শরীরটা পুরোপুরি স্থির, কিন্তু মাথায় একসাথে অনেকগুলো অর্থহীন চিন্তা এলেমেলোভাবে ঘোরাঘুরি করছে। ওর ঘর থেকে একটা পেয়ারা গাছ দেখা যায়, গাছে ডাসা ডাসা পেয়ারা ধরেছে। কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত কারনে গাছের মালিক কয়েকটি পেয়ারাকে কাপড় দিয়ে পেচিঁয়ে রেখেছে। ও গাছটির দিকে তাকিয়ে ছিল। হঠাৎ গাছটির একটি ডালে হলুদ রংয়ের একটা চাতক পাখি এসে বসল। বসেই 'চিটাপই চিটাপই' ডাক জুড়ে দিল আর ব্যস্ত ভঙ্গীতে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। যেন কাউকে খুজঁছে। তার একটুপরই অন্য একটি চাতক পাখি আগেরটির পাশে এসে বসল। এবার দুজনে একসাথে ডাকতে শুরু করল। মনে মনে হেসে উঠল জুলিয়া 'ও তাহলে এই ব্যাপার? আজ তোমাদের ডেটিংয়ের ডেট ছিল? ভ্যালেনটাইনস্ ডে কে তোমরাও সেলিব্রেট করার প্লান করছ?' এমন সময় হঠাৎ অনিন্দ্যর কথা মনে পড়ল ওর। ঠিক হঠাৎ নয়, গতকাল থেকেই মনে পড়ছে ভীষণ। শরীর একটু খারাপ হলেই কেন যে ওর কথা এত ঘন ঘন মনে পড়ে! এমন কি ওর মাসিকের সময়টাতেও ও ওকে খুবই মিস করে। মানুষ অসুস্থ্য হলেই কি তার প্রিয়জনের কথা বার বার মনে পড়ে? অনেকদিন আগে ওকে একটা মোমবাতি উপহার দিয়েছিলো অনিন্দ্য, সেটা ও যতবারই দেখে ততবারই ওর বুকটা ভোতাঁ এক ধরনের ব্যাথায় ভরে উঠে। অনিন্দ্যর কথা মনে পড়তেই ওর মনটা আরো খারাপ হয়ে গেল, কারন তিন-চার দিন হল ওর কোন দেখা নেই, এমনকি বেলকনিতেও আসে না। 'কি এমন ছাই ব্যস্ততা ওর?' মনে মনে অভিমান করল জুলিয়া। ওর এই অভিমান ও বেশীক্ষন নিজের ভেতর ধরে রাখতে পারবে না, এটা ও নিজেই জানে। ও ওদের প্রথম পরিচয়ের দিনটির কথা ভাবতে লাগল। এ ভাবনাটা ও বেশ উপভোগ করে।

প্রায় বছরখানেক আগের কোন এক গ্রীষ্মের দুপুর, ওর বাবা-মা বড় খালার বাসায় কি এক কাজে গিয়েছিলেন, সেদিন দুপুরের খাবারের পর ড্রয়িং রুমের সোফায় শুয়ে শুয়ে টিভি দেখছিলো ও। এমন সময় কলিংবেল বেজে উঠল। ঘড়িতে তখন সাড়ে তিনটা। কিছুটা বিরক্ত হয়ে দরজা খুলতেই ও পাথরের মত জমে গেল। প্রচন্ড নার্ভাস হয়ে দরজা প্রায় বন্ধ করে দিচ্ছিল আবার, এমন সময় ওর সামনে দাঁড়ানো ছেলেটি খুব ভদ্রভাবে বল্ল -'এটা কি ইকবালদের বাসা?' জুলিয়া কোন কথা বলতে পারল না, কোনরকমে শুধু মাথা দোলাল। -'আমার নাম অনিন্দ্য' -ছেলেটি আবার বলে উঠল- 'আমি ওর বন্ধু, ও কি বাসায় আছে?' জুলিয়া তখনও চুপচাপ দাড়িয়ে আছে। যেন অনিন্দ্যর কথা কানেই যায়নি। ওর মৌনতা দেখে আবার কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল অনিন্দ্য, তার আগেই জুলিয়ার পেছন থেকে একটা কণ্ঠ বলে উঠল -'আরে অনিন্দ্য যে, আয় ভেতরে আয়।' ইকবাল ওকে হাত ধরে টেনে ভেতরে নিয়ে এল। - 'বাসা চিনেছিস তাহলে?' 'একই এলাকায় থাকি বাসা না চেনার তো কোন কারন নেই।'- বলতে বলতে সোফায় বসল অনিন্দ্য। -'হু, শুধু গালভরা বুলি, আমাদের মহল্লায় এসেছিস মাসখানেক হতে চল্ল, আর এই তোর আসার সময় হল, তাই না?'- বলতে বলতে ইকবালও একটা কাউচের উপর বসে পড়ল। -'এ ক'দিন একদম সময় পাচ্ছিলাম না রে! বিশ্বাস কর। প্রাইভেট ইউনোভাসির্টিতে পড়ার ধকলটা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি' -অনিন্দ্য কৈফিয়ত দিল।

সেই সাথে ও আরো কিছু বল্ল, তবে সেটা শোনার জন্য জুলিয়া সে ঘরে ছিল না, ও এক দৌড়ে ওর ঘরে চলে গেল, সাদা একটা ট্রাউজার আর কালো রঙ্গের স্কীনটাইট একটা টি-শার্ট ওর পরনে ছিল, জুলিয়ার চোখে এখনও স্পষ্ট ভাসে, কি যে সুন্দর লাগছিলো অনিন্দ্যকে। কালো রংটা ওকে বেশ মানায়, তাইতো জুলিয়ার প্রিয় রং কালো, আগে ছিল গোলাপী।

পরিচয়ের মাসখানেক আগে একদিন, ভোরবেলা অনিন্দ্যকে প্রথম দেখে ও, বলতে গেলে দেখামাত্রই প্রেমে পড়ে যায় ওর। তারপর থেকে প্রতিদিন বিকেলে ছাদে উঠা থেকে পৃথিবীর কোন শক্তি আটকিয়ে রাখতে পারত না। আর, একটু সুযোগ পেলেই ও ওদের তিনতলার বারান্দা থেকে অনিন্দ্যদের ফ্ল্যাটে উঁকিঝুঁকি মেরে অনিন্দ্যকে দেখার প্রানপন চেষ্টা করত। আর ভাবত 'আহা কি হ্যান্ডসাম ছেলেটা! ওর সাথে যদি একটু ফ্রেন্ডশীপ করতে পারতাম। অন্ততঃ একদিনের জন্য হলেও!' নিজের অজান্তেই ও অনিন্দ্যকে নিয়ে অনেক আকাশ কুসুম চিন্তা করেছে, তাইতো ওর সে ঝলমলে রঙ্গীন সপ্ন-কল্পনার রাজপুত্রকে সাদা কালো বাস্তবের মাঝে, ওদের ড্রয়িংরুমের দরজার সামনে দেখে ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেছে, সেই সাথে অপরিসীম বিস্মিত, লজ্জিত এবং উচ্ছ্বসিত। 'ও আপনি তাহলে ভাইয়ার বন্ধু?' মনে মনে ভীষণ মজা পেল। 'ভাইয়া তুই কত ভাগ্যবান, অনিন্দ্য তোর বন্ধু!' মনে মনে ও যেন ইকবালকেই ইর্ষা করতে লাগল। কি কাকতালীয় ব্যাপার!' ও যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলো না 'অনিন্দ্য ওদের লিভিংরুমে বসে আছে? দেখতে তো পিচ্চি মনে হয়, অথচ কিনা অনার্সে পড়ছে!' বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা তখনও ও পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারছিলো না। 'আর কি সুন্দর নাম! অনিন্দ্য!' ও বালিশের উপর মুখ গুঁজে ফিসফিস করে বল্ল- 'কেমন আছো অনিন্দ্য? আমি তোমার বন্ধু হতে চাই, আমাকেও করবে তোমার বন্ধু?' বসার ঘর থেকে ওদের কথাবার্তার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল, তাই ঐ ঘরটা ওকে চুম্বকের মত টানছিল। একটু পর ইকবাল এসে বলল -'কিরে শুয়ে আছিস কেন? কাঁদছিস নাকি?' ও এক লাফে উঠে দাড়াঁল- 'কই নাতো!' -'ও আমার ফ্রেন্ড, আমরা একই কলেজে পড়তাম, আমাদের পাড়ায় নতুন এসেছে, কয়েকটা বাসা পরেই থাকে। আচ্ছা, তুই নাকি ওর সাথে কোন কথা না বলে শুধু ফ্যালফ্যাল করে ওর দিকে তাকিয়ে ছিলি? ঘটনা কি সত্যি?' বেশ সিরিয়াস ভংগিতে বল্ল ইকবাল। মূহুর্তে জুলিয়ার হালকা ফর্সা গাল দুটো হালকা লালচে রং ধারন করল, মাথা নিচু করে আবারো ও একই উত্তর দিল- 'কই না তো!' – হয়েছে আর লজ্জা পেতে হবে না,' মুচকি হেসে বল্ল ইকবাল -'দেখ ঘরে খাবার মত হালকা নাস্তা-টাস্তা কিছু আছে কিনা।' কাজের মেয়েটা ঘুমুচ্ছিলো, তাই ও নিজেই রান্নাঘরে বিড়বিড় করতে করতে গেল। 'বাহ্ এরমধ্যেই ভাইয়াকে বলে দেয়া হয়েছে? গাধা কোথাকার! দুপুর বেলা কেউ ফ্রেন্ডের বাসায় বেড়াতে আসে? গাধার গাধা, মহা গাধা, আস্ত একটা গাধার দাদা।' ও অনিন্দ্যর মুটামুটি চৌদ্দগোষ্ঠী উদ্ধার করে ফেল্ল, কিন্তু ওর ভেতর যে কি পরিমান আনন্দের বন্যা বয়ে যাচ্ছিল, সেটা ওকে দেখে তখন যে কেউই অনুমান করতে পারত। খুশীতে শুধু ওর চেহারা নয়, পুরো শরীরটাই যেন ঝলমল করছিল। ও মনে মনে কল্পনা করল অনিন্দ্যকে ও কিভাবে কথাটা বলেছে। 'বেল টিপতেই দরজা খুলে দিল তোর বোন। তোর কথা জিজ্ঞেস করলাম, মাথা নাড়ল, ভাবলাম বোবা নাকি? তুই আবার মাইন্ড করিস না। আবার তোর কথা জিজ্ঞেস করলাম, আগে তো মাথা নেড়েছিলো, এবার তাও করল না, চুপচাপ আমার দিকে হা করে তাকিয়ে রইল। আমি তো ভয়ে সারা। ভাবলাম আমার চেহারার জিওগ্রাফী হয়ত কোন কারনে চেঞ্জ হয়ে গেছে। তাই দেখে হয়ত তোর বোন ভয় পেয়ে গেছে। একবার তো দরজাই লাগিয়ে দিচ্ছিল। তোদের বাসার আয়নাটা

কোথায় বল তো, জিওগ্রাফী চেঞ্জ হয়ে গেছে কিনা শিওর হয়ে নিই। হা হা হা'– এ পর্যন্ত চিন্তা করেই শিউরে উঠল জুলিয়া। ছি: ছি: কি লজ্জা!'

'আফা, আফনের দুত'- কাজের মেয়েটার কথায় সম্বিত ফিরে পেয়ে পেয়ারা গাছ থেকে চোখ সরিয়ে ঘুরে দাঁড়াল জুলিয়া। কথার কি ছিরি! জুলিয়া ওকে বহুবার বলেছে 'আপা আপনার খাবার জন্য দুধ এনেছি' বাক্যটা পুরো বলতে। কিন্তু ওর নাকি মনে থাকে না। দুধের গ্লাসটা হাতে নিয়ে তাতে ছোট্ট করে একটা চুমুক দিল। সাথে সাথে বিশ্রী একটা গন্ধ পেল ও। গন্ধটার সাথে ওদের কাজের মেয়েটার দেহ থেকে নির্গত গন্ধের কিছুটা মিল খুঁজে পেল ও। সারা শরীর গুলিয়ে উঠল জুলিয়ার। এর আগেও বহুবার এমন হয়েছে। দুধের ভেতর ও ওদের কাজের মেয়ের গায়ের গন্ধ পায়। দু চুমুক খেয়ে গ্লাস ফিরিয়ে দিয়ে বল্ল- 'আর খাব না, নিয়ে যা' 'আপনের অসুখ, দুত কামে দিব। কাইয়া উডেন আপা।' জুলিয়ার রাগ উঠে গেল, তবু শান্ত স্বরে বল্ল- 'খেতে ইচ্ছে করছে না, নিয়ে যেতে বলেছি নিয়ে যা।' - 'কাইতে ইচ্ছা না করলেও কান, নাইলে খালাম্মায় বকব, চোক বুইনজা এক টান দিয়া কাইয়া পালান (খেয়ে ফেলেন)।' এবার চড়া সুরে বলে উঠল জুলিয়া 'তোকে বলেছি না নিয়ে যেতে, এত কথা বলছিস কেন? এক চড় মেরে দাঁত সব ফেলে দিব।' মেয়েটা ধমক খেয়ে মাথা নিচু করে চলে গেল। ভীষণ মাধা ধরে গেছে জুলিয়ার। একটু জোরে কথা বল্লেই ওর মাথা ধরে যায়। তবে মজার ব্যাপার হল, অনিন্দ্যর কথা ও যতক্ষন ভাবে, ততক্ষন মাথা ব্যথার কথা ওর মনেই থাকে না। হঠাৎ এই মুহূর্তে ওকে দেখতে জুলিয়ার ভীষণ ইচ্ছা হল। আর এর জন্য ওকে ছাদে যেতে হবে। তবে ছাদে গেলেই যে ওর সাথে দেখা হবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। কারন ইদানিং ও ক্যালকনিতে আসা বহুলাংশে কমিয়ে দিয়েছে। কদিন ধরে তো আসছেইনা, তবু প্রতিদিন রুটিন করে জুলিয়া ছাদে যায়। যদি ওর সাথে কাকতালীয় ভাবে দেখা হয়ে যায়, যদিও সে সম্ভাবনা খুবই কম, আর তাছাড়া ও এধরনের কোন ব্যাপার সহজে বিশ্বাস করতে পারে না, তবুও মাঝে মাঝে কাকতালীয় কোন কিছুর উপরও ভরসা করতে ইচ্ছে হয়। ছাদে যেতে ওর শরীরটা চাচ্ছে না, সারা শরীরে ভোতাঁ এক ধরনের ব্যাথা, কিন্তু মনটা ছাদের দিকে একেবারে উড়ু উড়ু। ও জানে ওর শরীর কিছুক্ষনের মধ্যেই ওর মনের কাছে হার মানবে। ও চুপি চুপি ঘর থেকে বের হয়ে সদর দরজা খুলে ছাদের সিঁড়ি ডিঙ্গাতে লাগল। প্রায় নিঃশব্দে, মা যাতে ভুলেও টের না পায়, পেলে সমূহ বিপদ, কমপক্ষে ১০১টা কৈফিয়ত দিতে হবে তাকে। তবুও ওকে অসুস্থ্য দেহ নিয়ে ছাদে যাবার পারমিশন দেয়া হবে কিনা সন্দেহ! মার ধারনা অসুস্থ্যাবস্তায় ছাদে গেলে শরীর আরো খারাপ করে। বরং ছাদে গিয়ে অনিন্দ্যর দেখা পেলে ওর শরীর-মন দুটোই আরো ভাল হয়ে উঠবে। 'আজও যদি ও না আসে?' সিড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ছোট্ট এই আশংকায় বুক দুরুদুরু করে উঠল ওর। তবে ওর মনে হচ্ছে ও আজ ঠিকই আসবে। ভালোবাসার দুর্নিবার আর্কষনকে অগ্রাহ্য করার মত যথেষ্ট ক্ষমতা বিধাতা সবাইকে দেন না। হয়ত অনিন্দ্যকেও দেননি।

জুলিয়া ছাদে এসে দাঁড়াল। ওর হার্টবিট এত জোরে পালস্ করছে যে ও যেন বাইরে থেকেও সে শব্দ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে। ভয়ে ভয়ে ও অনিন্দ্যদের বেলকনির দিকে তাকাল। কয়েকটা বাড়ি আর নারকেল গাছের ফাঁক দিয়ে কোনমতে ওদের বাড়িটা দেখা যায়, কিন্তু জুলিয়া দেখে দেখে এতই অভ্যস্ত যে এখন ও এক নজরেই সবকিছু দেখে ফেলে। প্রচন্ড টেনশনে চোখ যেন ঘোলা হয়ে গেছে, সেই ঘোলা দৃষ্টি নিয়েই তাকাল জুলিয়া। যেন ঘন কুয়াশার মাঝ থেকে ধীরে ধীরে অনিন্দ্যদের বেলকনিটা ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল। সেটা যে খালি এটা বুঝতে ওর কয়েক সেকেন্ড সময়

লাগল। প্রবল হতাশায় ওর বুকটা নিমিষেই ভরে উঠল। অনিন্দ্য নেই সেখানে। শুধু ওর একটা ভেজা লুংগি একটা তারে মেলে দেয়া। সেটা দেখে ও বুঝল যে অনিন্দ্য ভার্সিটি থেকে একটু আগেই ফিরেছে। গোসল করে লুংগি শুকাতে দিয়েছে। ওর চোখে পানি এসে গেল। শরীর দুর্বল হয়ে পড়লে কি মনও দুর্বল হয়ে পড়ে?

'আল্লাহ, ওকে কতদিন দেখি না।' ও কাঁদ কাঁদ হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে বিড় বিড় করতে লাগল -'তুমি তো জান, আমি কি কষ্ট পাচ্ছি। তুমি ওকে বেলকনিতে এনে দাও খোদা। তুমি নাকি অসুস্থ্য মানুষের দোয়া কবুল কর। আল্লাহ আমার মনটাকে আর কষ্ট দিও না।'

একটু পরই অনিন্দ্য ওদের বেলকনিতে মোড়া এনে পেতে বসল। হাতে ধুমসি একটা বই। ও খুশিতে প্রায় চিৎকার করে উঠল। আল্লাহ ওর দোয়া কবুল করেছেন। 'আল্লাহ তুমি খুব ভাল' মনে মনে বলেই ও নীচে ছুট লাগাল ওর অনিন্দ্যকে আরো ভালভাবে দেখার জন্য। গাধাটা এতদিন পর বেলকনিতে এসেছে! এই মাহেন্দ্রক্ষনটা ও ভাল করে উপভোগ করতে চায়। চুপিসারে ঘর থেকে ওর ডিজিটাল বাইনোকুলারটা নিয়ে আবার ছাদে এল। এটা ওর বড় মামা ইংল্যান্ড থেকে কিনে এনে ওকে ওর বার্থ ডে তে গিফট করেছেন। ওর বড়লোক বড় মামা ওকে অসম্ভব আদর করেন। এস.এস.সি তেএ প্লাস' পেলে ওকে একটা ল্যাপটপ কিনে দেবেন বলেছেন। প্রথমে ও ভেবেছিলো বাইনোকুলার দিয়ে কি করবে? কিন্তু এটা যে কি কাজের সেটা ও হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। জিনিসটা আসলেও বেশ কাজের। ৯০ ডিগ্রি এ্যাঙ্গেলে সর্বচ্চো জুম করলেও পিক্সেল ঘোলা আসে না। আরো মজার ব্যাপার হল ওটা অটোমেটিকলি ক্লিয়ার রেজ্যুলেশন সেট করতে পারে। অনেকদিন থেকেই ওর সাইকেলের খুব শখ ছিল, ভেবেছিলো মামা ওকে তাই দেবে। ওর মন খারাপ দেখে মামা বল্লেন - 'তুই মেয়ে মানুষ, সাইকেল দিয়ে কি করবি?' -'মামা তুমি খুব বুদ্ধিমান, সত্যি, আমার সাইকেলের প্রয়োজন নেই।' প্রায়ই বলে ও। 'আল্লাহ ও যেন চলে না যায়।' সিড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে প্রার্থনা করল ও। ওর ভয় হচ্ছিল বাইনোকুলার নিয়ে এসে দেখবে অনিন্দ্য ভেতরে চলে গেছে। '...নাহ্ ও এখনও আছে।' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল্ল জুলিয়া। বাইনোকুলারটা চোখে লাগাল, একদম পরিস্কার দেখা যাচ্ছ অনিন্দ্যকে, আর এত কাছে যেন চাইলেই ওকে হাত দিয়ে ছুঁয়ে দিতে পারবে। সামনের নারকেল গাছটার কয়েকটা পাতা শুধু ওকে ডিসটার্ব করছে। 'ধুত্, ছাতার এগুলো সরে না ক্যান?' বাইনোকুলার থেকে চোখ না সরিয়ে ভীষণ বিরক্ত হয়ে বল্ল ও। কি আশ্চর্য! ওর কথা শেষ হতে না হতেই একটা দমকা বাতাস এসে পাতাগুলোকে অনেকক্ষন একপাশে সরিয়ে রাখল। আর ও-ও প্রান ভরে ওর অনিন্দ্যকে দেখল। 'উফ্ কি ভীষণ স্মার্ট লাগছে ওকে!' ওর বিড়বিড় কণ্ঠে বিস্ময় যেন উপচে পড়ছে। অনিন্দ্যর পরনে ধূসর রঙ্গের একটা মোবাইল প্যান্ট আর একটা কালো রঙ্গের টি শার্ট। বুক আর হাতের মাংপেশীতে শৈল্পিকভাবে লেপ্টে আছে ওটা। ওর লালচে সিল্কি চুল গুলো বাতাসে উড়ছে, গোধূলির রক্তবর্ন ওর চেহারার একপাশে আচল বিছিয়ে পড়ে আছে। সেটা ওর পুরো মুখমন্ডলটাকে অদ্ভুত মায়াময় করে তুলেছে। জুলিয়া তন্ময় হয়ে দেখছে। আশেপাশের বিল্ডিংয়ে আরো অনেক মেয়ে উঠেছে, প্রতি বিকেলেই ওরা ছাদে ভীড় করে। মাসখানেক ধরে কোন এক অজানা কারনে জুলিয়া ওদের দুচোখে দেখতে পারে না। ঠিক যেমন দুজন সতীন দুজনের চোখের বালি। ও মনে মনে বলছে- 'আল্লাহ ওকে যেন এখন আর কোন মেয়ে না দেখে, আল্লাহ্...' আল্লাহ হয়ত ওর এ দোয়াও কবুল করলেন। কারন ও চেয়ে দেখল আশেপাশের কেউ ওদের দেখছে না, সবাই যার যার কাজে ব্যস্ত। আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেল্ল ও। এমন সময় পেছন থেকে ওদের

কাজের মেয়েটা ওকে ডেকে উঠল -'আফা, ছাদের এত কিনারে খারাইছেন ক্যান? আর ঐডা দিয়া এত মুনযুগ দিয়া কি দ্যাকতাছেন?' ওর কৌতুহলী কণ্ঠে জুলিয়ার রাগ চরমে উঠে গেল। পেছনে ফিরে দেখে মেয়েটা একগাদা কাপড় কোলে নিয়ে দাড়িঁয়ে ওর দিকে দাঁত কেলিয়ে তাকিয়ে আছে। ছাদের শুকনো কাপড় নতে এসেছে। ও খুব শান্ত স্বরে বল্ল না -'কিছু না, এমনি তাকিয়েছিলাম। তুই যা, আর শোন, মাকে বলিস না যে আমি এখানে।' সে তার হলদেটে দন্ত আরো বিকশিত করে বল্ল - 'হেয় যুদি জিগায়?' -'তাহলে বলবি আমি রীতাদের বাসায়'। -'আইচ্ছা'- ঘাড় কাত করে সায় দিল মেয়েটা। রীতা ওদের ভাড়াটে, নীচতলায় থাকে, ওরা একই স্কুলে, একই ক্লাসে পড়ে। 'আমার ধমকে কিছু মনে করিসনি তো?' -'কি যে কন আফা'- মুচকি হেসে বল্ল মেয়েটা -'মনে করা-করির কি আছে? আপনেগো ধমক হইল গিয়া আমগো লাইগ্যা আশীর্বাদ।' এবার হেসে ফেল্ল জুলিয়াও, হাসতে হাসতে বল্ল -'ধুর গাধী, ধমক তো সবসময়ই ধমক, ওটা আবার আশীর্বাদ হতে যাবে কেন?' মেয়েটা কিছু না বুঝেই বিজ্ঞের মত মাথা নাড়তে নাড়তে চলে গেল। জুলিয়া আবার ওর কাজে মন দিল। একটুপর বিড়বিড় করে আবার বল্ল -'কি সুন্দর! তুমি কোথায় ছিলে এতদিন অনিন্দ্য? তোমার দেখা এতদিন পরে কেন পেলাম?' হঠাৎ ওর খেয়াল হল যে অনিন্দ্য বই পড়ছে না, বইটা হাতে ধরে আছে ঠিকই, কিন্তু অন্যমনস্কভাবে অন্যদিকে তাকিয়ে আছে। 'কি ভাবছে ও? লোপার কথা নাকি?' মনে মনে ভাবল ও। মাথে মাথেই ওর মনটা খারাপ হয়ে গেল। লোপার ব্যাপারটা ও জেনেছে ইকবালের কাছ থেকে। প্রথমে তেমন পাত্তা দেয়নি। কিন্তু প্রায়ই অনিন্দ্য যখন ওর কথায় লোপার প্রসঙ্গ অপ্রাসঙ্গিকভাবে টেনে আনত, তখন প্রথম প্রথম বিরক্তি লাগত, এখন ওর ভয় হয়। আর লোপাকে ও ঘৃণা করে। কেন করে ও ঠিক নিজেই জানে না। অনিন্দ্যকে এর আগে যখনই ও বারান্দায় দেখেছে, কোন না কোন কাজে ওকে বিজি দেখেছে। হয় কর্ডলেস দিয়ে ফোনে কথা বলছে, নয়তো বই পড়ছে, নতুবা ছোট বোন আর মাকে নিয়ে কফি খাচ্ছে, আবার হয়তো ফুলগাছগুলোতে পানি দিচ্ছে। কিন্তু আজ ওকে এমন বিষন্ন মনে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে ওর প্রতি জুলিয়া রাগ এবং মায়া দুটোই একসাথে অনুভব করল। -'দাড়াঁও বাছাধন, লোপার কথা তোমায় ভাবাচ্ছি।' প্রায় দাঁত কিড়কিড় করে বলে ও ঘুরে দাড়াঁল। চারপাশ বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। ও সিঁড়িতে পা দেবার সাথে সাথেই মসজিদ থেকে মাগরিবের আযান শোনা গেল। আজ ও মাগরিবের নামায পড়বে বলে সিদ্ধান্ত নিল। সৃষ্টিকর্তার উপর আজ ও ভীষণ কৃতজ্ঞ। গরম পানি দিয়ে অযু করে ঘরের দরজা আটকিয়ে জায়নামাযের উপর চুপচাপ বসে রইল। ও বইতে পড়েছে মাসিকের সময় মেয়েদের নামায পড়া বারন, নামাযের জায়গায় শুধু চুপ করে বসে থাকতে হয়। ব্যাপারটা ও বেশ উপভোগ করে। তাইতো ঐ বিশেষ সময়টাতেই ওর ইবাদত প্রিতী বেড়ে যায়। কতবার মনে মনে ভেবেছে, এবার ওটা বন্ধ হলেই নিয়মিত নামায পড়া শুরু করবে। কিন্তু ঐ ভাবনা পর্যন্তই। তবে আজকের ব্যাপারটা আলাদা। ও বসে বসে মৃদু শব্দে, অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে মোনাজাত করতে লাগল -'আল্লাহ, আপনি অনিন্দ্যর মন থেকে লোপাকে মুছে আমাকে বসিয়ে দিন।' বলতে বলতে ওর গলা ধরে এল। 'আমি তো এর আগে আপনার কাছে এভাবে কিছু চাইনি। আপনি আমার মনটাকে একটু শান্ত করে দিন।' এবার ওর চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়ে ওর কোল ভিজিয়ে দিল। একটু পর ওর কাছেই ব্যাপারটা কেমন হাস্যকর আর স্বার্থপরের মত শোনাল। আগে কখনো ওর এমন হয়নি। অথচ আজ অনিন্দ্যর জন্য...সত্যিই অব্যক্ত অথবা প্রত্যাখাত ভালোবাসার কাছে মানুষ কতটাই না অসহায়! দোয়া শেষ করেই ফোন করল, ওর শরীর আবার গরম হতে শুরু

করেছে। একটু পরেই হয়ত ঝুপ করে জরও নেমে যাবে। রাত যত বাড়তে থাকবে, রাতের সাথে পাল্লা দিয়ে জ্বরও তত বাড়তে থাকবে।

ওপাশে অনেকক্ষন ধরে রিং হচ্ছে, কেউ ধরছে না। 'যা ভেবেছি' মনে মনে বল্লও-'ঠিক লোপার কথা ভাবছে, তাই ফোনের রিং পর্যন্ত গাধাটার কানে ঢুকছে না। একবার যদি লোপাটাকে পেতাম...' শেষের বাক্যটা বল্ল দাঁত কিড়মিড়িয়ে যেন লোপাকে পেলে ও ওর মাথাটাই আস্ত চিবিয়ে খেত। ফোন বেজেই চলেছে, ওর হার্টবিটও একই তালে ধীরে ধীরে বাড়ছে। একটুপর হতাশ হয়ে যেই না রিসিভারটা রাখতে যাবে, অমনি অনিন্দ্যর গলা শোনা গেল। -'হ্যালো স্লামালাইকুম, কে বলছেন?' জুলিয়ার মাথাটা হালকা চক্কর দিয়ে উঠল। প্রায় ৫০ ঘন্টা পর ও অনিন্দ্যর ভয়েস শুনতে পেল। প্রচন্ড আবেগে আবার ওর চোখে পানি এসে গেল। ও অনেকক্ষন কোন কথা বলতে পারল না। ওর ইচ্ছে করছে অনিন্দ্যর মাথাটা শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে বুকে চেপে ধরতে। ওর ইচ্ছেটা কি কোনদিন পূরন হবে? আর অনিন্দ্য কি কোনদিন জানতে পারবে ওর ঐ ছোট্ট বুকে ও অনিন্দ্যর জন্য কি অসীম পরিমান ভালোবাসা জমিয়ে রেখেছে? আর জানলেও তার কতটুকুই বা প্রতিদান দিতে পারবে অনিন্দ্য? হয়ত অনেককিছুই দিতে চাইবে। কিন্তু ভালোবাসার পরিপূর্ণ প্রতিদান হিসেবে অন্ত তঃ সমপরিমান ভালোবাসা দেয়া ছাড়া ভালোবাসার সার্থক প্রতিদান কি কখনো আর কিছু হয়? ভালবাসা দিবসকে উপলক্ষ্য করে হলেও পৃথিবীর প্রতিটি হৃদয় যুগলের জন্য কতটুকু ভালবাসা বাড়তি পাওনা হয়ে দাঁড়ায়? অনিন্দ্যরা হয়ত কখনও জুলিয়াদের ভালবাসাকে জানতে পারে না। আর জানলেও তারা ক'জনইবা সে ভালবাসার ঋণ শোধ করার চেষ্টা করে?

মুর্শেদুল কবীর, কোগরা, সিডনী

(বি:দ্র: এই গল্পটির চরিত্র ও ঘটনা পুরোপরি কাল্পনিক নয়। তবে সঙ্গত কারনে স্বল্প কিছু ক্ষেত্রে বাস্তবকে শুধুমাত্র কিছুটা পরিবর্তন করা হয়েছে। তবু অন্য কারো নাম বা ব্যক্তিগত কোন ঘটনার সাথে ব্যাপারটা মিলে গেলে সেটা হবে সম্পূর্ন কাকতালীয়।)